দৈনিক [illegible]

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫...

AUG. 25 2002
AUG. 25 2002

আইসিটি ॥ হওয়া না হওয়া

সময় বয়ে চলেছে, দিনের পর দিন, মাস পার করে বছরগুলোও ঘুরে আসছে, নতুন শতাব্দী সহস্রাব্দ শুরু হয়েছে; তাও দুটো বছর পার হতে চলল–তেমন কিছু কি হয়েছে? অন্যদের হয়েছে, আমাদের হয়নি। ডিজিটাল ডিভাইডের পরিচয় এখন আর বুঝিয়ে বলতে হয় না, পিছিয়ে পড়ার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, না জানার দৈন্য, চেতনার ঘাটতি–এসব এখন প্রকট। যে প্রযুক্তির হাত ধরে আধুনিকতা আসবে, উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা ছিল, সে আশা ভেঙ্গে গেছে। কিছুই কি হয়নি?

কিছু না হয়ে পারে না, তবে ভাল-মন্দ দুটোই হতে পারে। মন্দের প্রতিই যেন প্রত্যাশা আমাদের বেশি। আমরা মন্দগুলোই বেশি করছি। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আশা ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য লোকবল পাওয়া যাবে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, অরাজকতার চরম অবস্থা চলছে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন রাজনীতির ঘোলা পানি পাক খাচ্ছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা, গোলাম আজমকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ওখানে–পশ্চাৎপদতা ও প্রগতি একসঙ্গে চলতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইনে ডাই। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও লেখাপড়ার চেয়ে গোলমাল বেশি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া শিখতে আসা সাধারণ ছাত্রছাত্রী আর রাজনীতি করণেওয়ালা অসাধারণরা দুই কাতারে চলে গেছে। বিভাজন সুস্পষ্ট; কিন্তু সংখ্যালঘু রাজনীতির ভবিষ্যত রাজনীতিবিদদের হাতে তৈরি সোনার ছেলেরা সব উল্টেপাল্টে দিয়েছে। সঙ্গে আছেন কিছু শিক্ষিত নামের কলঙ্ক মূর্খের সেবাদাস শিক্ষক। জ্ঞানহীনতার ভণ্ডামি ও ক্ষমতার লোভ তাদের ব্যক্তিত্বহীন করেছে–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক হয়ে যাওয়া ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী আর প্রোক্টরদের মতো চরিত্র সব। এদের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হবে আশা করলে পস্তাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন সেখানে এখন লেখাপড়াই প্রায় বন্ধ। তথ্যপ্রযুক্তি এমনি এমনি লাউডগার মতো লকলকিয়ে বেড়ে উঠবে, এমন আশা করা যায় না। অবশ্য করছেন আমাদের নীতিনির্ধারকরা। যাঁরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি তা বোঝা দূরের কথা, ঠিকমতো উচ্চারণই করতে পারেন না তাদের হাতে অনেক দায়-দায়িত্ব বর্তেছে। কাজেই কী হচ্ছে আর কী হবে তা বুঝতে বেগ পেতে হবে কেন? কেউ কেউ ব্যতিক্রম যে নেই তা তো নয়। আছেন বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আর দু'চারজন সরকারী দায়িত্বশীল অবশ্যই আছেন, কিছু বিদগ্ধ শিক্ষক আছেন বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু তাদের কথামতো কিছু হচ্ছে বলে তো মনে হয় না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পুরো বিষয়টাই যে জ্ঞানভিত্তিক-গণিতভিত্তিক তা অনেকে ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছেন। বিনোদনের বিষয়টাকে আকর্ষণে পরিণত করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটানোর চেষ্টা চলছে। তারপরও এটা মানুষকে খুব একটা টানবে বলে মনে হয় না। মানুষকে টানা এক কথা, আর পেশাগত প্রয়োজন সৃষ্টি করে উপযোগিতা বাড়ানো আর এক কথা। দশ বছর কি পাঁচ বছর আগেও যারা কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষা নিতে এগিয়ে এসেছিল তারা মনে করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পেশায় ব্যাপকহারে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হবে দেশে, ভাল বেতনের চাকরি পাওয়া যাবে। বিদেশের লোভ আরও বেশি ছিল, কিন্তু সবাইতো আর বিদেশে যাওয়ার মতো মান অর্জন করতে পারেনি। দেশেও ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং পেশাগত উপযোগিতা সৃষ্টি হয়নি। বিদেশের দুয়ার খানিকটা রুদ্ধ হয়ে গেছে অন্য কারণে। প্রথমত ১১ সেপ্টেম্বর (২০০১)-এর পর থেকে ভিসা সমস্যা প্রকট হয়েছে, খানিকটা অর্থনৈতিক মন্দার প্রকোপও দেখা দিয়েছিল, দ্বিতীয়ত এখন উচ্চমান ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ই-ওয়ার্কার চাচ্ছে পশ্চিমের দেশগুলো। নতুন কমিউনেকশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে খানিকটা শিথিলতা আছে; কিন্তু মূল বিষয় সফটওয়্যার তৈরির চাকরি বা ব্যবসা দু'ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কাজেই বিদেশে সুযোগ পাওয়াটা বেশ কঠিন আবার দেশে সুয়োগ ক্রমই রয়েছে; কাজেই সহজে এখন কেউ আর আসতে চাচ্ছে না। প্রথম দিকে অর্থাৎ বছর দশেক আগে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে সবাইকে ডাকা হতো, অনেক শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানই এমন ধারণা দিত, যে কোন বিষয়ের লোককেই তারা প্রোগ্রামার বা কোন না কোন প্রফেশনাল বানিয়ে দেবে। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়. গণিতে বিশেষ দক্ষতা না থাকলে গণিতবিষয়ক এই প্রযুক্তিভিত্তিক পেশাগত শিক্ষা নেয়া যায় না। এজন্যই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ড্রপ আউট বেড়েছে, নতুন আগ্রহীরা ভয় পেয়েছে। অনেকে অর্থের অপচয়ও মনে করতে শুরু করেছে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কম্পিউটার লিটারেসি বা ব্যাপক কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষার একটা ধারণা দেয়া হয়েছিল কিন্তু সেদিকে না সরকার গেছে, না বেসরকারী উদ্যোক্তারা গেছে। এটা আসলে প্রফেশনাল বানানোর মিশন নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবাই যাতে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে তার প্রাথমিক শিক্ষাটা দেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্কুল-কলেজে এমনভাবে পাঠ্যক্রম তৈরি করা হলো যে- যে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিল তা এখনও চলছে। আসলে কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষা বিষয় দুটোকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন নিম্নপর্যায়ে দেয়া হবে এবং ওটাকেই কম্পিউটার লিটারেসির উদ্যোগ বলে চালিয়ে যাওয়া হবে তা বোধগম্য নয়। এসব বিষয়ে আগে যে কেউ কিছু বলেনি তা নয়; কিন্তু এ দেশে যারা জোরে কথা বলতে পারে আর যাদের পিছনে রাজনৈতিক খুঁটি আছে তারাই উৎরে যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পাঠ্যক্রম কঠিন রেখে আবার এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে কেউ আর সহজে ওপথে পা না বাড়ায়। কারণ চূড়ান্ত পরীক্ষায় নম্বর যোগ করানোটা বেশ কঠিন করে দেয়া হয়েছে।

আবার উচ্চতর পর্যায়ে গাণিতিক সৃজনশীলতা দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে তেমন কিছু করার চেষ্টা হয়নি। শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ ছিল সেগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে; কিন্তু সফটওয়্যার শিল্পের জন্য মূল বিষয় গবেষণার সুযোগ ছাত্র-শিক্ষক কেউই পাননি। আসলে সফটওয়্যার শিল্পের জন্য বিশেষ করে প্রোগ্রামিং করতে গেলে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হয় যেটা অনেকেই বলেননি। অনেক ক্ষেত্রে লেদ মেশিনের কাজ শেখানোর মতো ফর্মামাফিক লোহা কাটার কাজ শেখানো হয়েছে। নতুন সমস্যা তৈরি করে সেগুলোর সমাধানের চেয়ে স্কুল পর্যায়ের পাটিগণিতের মতো আগে সমাধান করা সমস্যার সমাধান উত্তর মিলিয়ে করাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রোগ্রামিং শেখা বা সফটওয়্যার তৈরির জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রফেশনাল চাইলে তো ওতে হবে না। কারণ কোন প্রতিষ্ঠান, তা সে বাণিজ্যিক হোক বা প্রশাসনিকই হোক, তারা অন্য একটা কপি করা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চাইবে না। প্রোগ্রামার বা অন্যান্য প্রফেশনাল তারা রাখবে নতুন কৌশলের নিজেদের সফটওয়্যার তৈরির জন্য। এর সঙ্গে একদিকে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, অন্যদিকে স্বকীয়তার বিষয়টি তো আছেই।

প্রযুক্তি প্রজন্ম

আবীর হাসান

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব বিষয়ে প্রাধান্য দেয় না। এ জন্যই দেখা যায়, তরুণ শিক্ষার্থীরা উদ্যম নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় একসময় ভাল করত; কিন্তু এখন সে রকম পারফরমেন্স দেখাতে পারছে না। কোন কোন সময় কিছু কিছু সাফল্য পেলেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যাচ্ছে না। বুয়েট এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করছেন; কিন্তু প্রধান প্রবণতা হিসাবে প্রোগ্রামার প্রশিক্ষণ দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রায়ই অভিযোগ করছে, তাদেরকে গণিতের সৃজনশীল ব্যবহার শেখানো হচ্ছে না। অনেক শিক্ষার্থী বুঝতেই পারছে না যে তারা কি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্যে তো বটেই অনেক উন্নয়নশীল দেশেও এ সমস্যার সমাধান দু'ভাবে হয়েছে। প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উদ্যোগ নিয়েছে সরকারী সহায়তায়, দ্বিতীয়ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুযোগ দিয়েছে গবেষণার। আমাদের দেশে দুটোর কোনটাই নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে না। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কও গড়ে উঠছে না অথচ এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই অন্তত সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ সরকার নিতে পারে। এতে করে শিক্ষার মানের ব্যবধান কমতে পারে। শিক্ষকরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে পারেন। এছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিভাগ ও বাণিজ্য অনুষদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সমন্বয় করতে হবে। শিক্ষা খাতের চেয়ে বাণিজ্যিক খাতে বিশেষ করে বেসরকারী বাণিজ্যিক খাতে অর্থপ্রবাহ বেশি কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কোন প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার ল্যাব তৈরি করেছে এবং সেখানে সদ্য পাস করা মেধাবী শিক্ষার্থীরা কাজ করছে এমন নজির নেই। নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। সরকার একটি ইনকিউবেশন সেন্টার করার উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু ওখানে কারা যাবে–প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো, নাকি নতুন উদ্যোগীরা? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আর একটি দৈন্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের চাকরি করতে যত উৎসাহ দেয়া হয় ব্যবসা করতে তার সিকি ভাগ উৎসাহও দেয়া হয় না। এখন তাও শিক্ষকতা করার জন্য কিছুটা উৎসাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে–এটা কাজে দেবে, শিক্ষক সমস্যা হয়ত আগামীতে থাকবে না; কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি থেকে জাতীয় উন্নয়নের উপজীব্য পেতে হলে আরও আধুনিক চিন্তা করতে হবে নীতিনির্ধারকদের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রকদের বিশেষ ভূমিকা প্রয়োজন।